পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রমাণ ও মুজিজার বিশ্বকোষ

মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

বৈজ্ঞানিক মুজিজা · ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য · সত্য হয়ে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী

তাওরাত ও ইনজিলের সুসংবাদ · জিন, জাদু ও অদৃশ্যের জগৎ

শিশুও বুঝতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা · 157টি রঙিন চিত্র

157টি প্রমাণ, শক্তি অনুসারে সাজানো

চতুর্থ পর্ব

নবি ﷺ-এর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মুজিজাসমূহ

তাঁর সাহাবিগণ নিজেদের চোখে যা দেখেছেন এবং অবিচ্ছিন্ন সনদে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন: আঙুলের ফাঁক থেকে উৎসারিত পানি, তাঁর জন্য কেঁদে ওঠা খেজুরগাছের কাণ্ড, আর মক্কার আকাশে দ্বিখণ্ডিত চাঁদ।

16 প্রমাণ

আকাশে এক নিদর্শন

১১২ মক্কার আকাশে চাঁদ ফেটে গেল

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে, আর চাঁদ ফেটে গেছে। আর তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে: এ তো চলতি জাদু।

সূরা আল-কামার — আয়াত 1-2

এমন এক ঘটনা, যা মক্কার সবাই দেখেছিল — মুমিন আর অস্বীকারকারী উভয়েই

সহজ কথায়

আকাশে চাঁদ দুই টুকরো হয়ে গেল, এমনকি মানুষ দুই টুকরোর মাঝখানে হেরা পাহাড় দেখতে পেল। আর মুশরিকরা এ কথা অস্বীকার করেনি যে তারা দেখেছে — তারা বলেছিল: **"মুহাম্মদ আমাদের জাদু করেছে।"**

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরাইশ নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর সত্যতা প্রমাণের জন্য চোখে দেখা যায় এমন একটি নিদর্শন দাবি করে আসছিল। যখন তা এল, তারা বলল না "আমরা কিছুই দেখিনি" — যা ছিল সবচেয়ে সহজ ও সবচেয়ে নিরাপদ উত্তর — বরং যা দেখেছে তার ব্যাখ্যা দিল জাদু বলে। **আর এটিই নিজে প্রমাণ করে যে তারা তা চোখে দেখেছিল।**

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

আয়াতটি নাজিল হয়েছে **সম্পন্ন অতীত কালে**: "চাঁদ ফেটে গেছে" — "ফাটবে" নয়। চাঁদ ফাটার হাদিস **সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে** একাধিক সনদে বেশ কয়েকজন সাহাবি থেকে বর্ণিত: ইবনে মাসউদ, আনাস, ইবনে আব্বাস, আর মুসলিমে ইবনে উমর। জুবাইর ইবনে মুতইমের হাদিসটি আহমাদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, আর হাকিম তা শাইখাইনের শর্তে সহিহ বলেছেন। ইবনে মাসউদের হাদিসে তাঁরা যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা আছে: "এমনকি তারা চাঁদের দুই টুকরোর মাঝখানে পাহাড়টি দেখতে পেল"। হাদিসবিদদের মতে এই সংবাদ তাওয়াতুরের স্তরে পৌঁছে গেছে।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

প্রমাণ এখানে কেবল ঘটনার মধ্যে নয়, বরং **বিরোধীদের প্রতিক্রিয়ায়**। আয়াতটি তাদেরই সামনে মক্কায় পড়ে শোনানো হয়েছে, তারা তখনো জীবিত; আর তাতে বলা হয়েছে, চাঁদ তাদের চোখের সামনেই ফেটেছে। যদি তা না ঘটত, তবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ কাজ ছিল বলা: "কখন? আমরা তো কিছুই দেখিনি।" অথচ তারাই ছিল তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করতে সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব, আর তাঁর বিরুদ্ধে কবিতা, জাদু ও পাগলামির অভিযোগ আনতে তারা এতটুকু দ্বিধা করেনি। তবু তারা **অস্বীকার নয়, ব্যাখ্যা বেছে নিল** — আর এটিই সম্ভাব্য সবচেয়ে জোরালো সাক্ষ্য। আয়াতটি নিজেই তাদের জবাব লিখে রেখেছে: "**আর তারা বলে: এ তো চলতি জাদু**" — যুক্তি আর তার জবাব, দুটোই একসঙ্গে নথিভুক্ত।

১১৩

তাঁর হাত থেকে পানি

তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ফুটে ওঠা পানি

তিনি সেই পাত্রে নিজের হাত রাখলেন, আর পানি তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরনার মতো ফুটে উঠতে লাগল; আমরা পান করলাম আর অজু করলাম। আনাসকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বললেন: প্রায় তিনশ।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

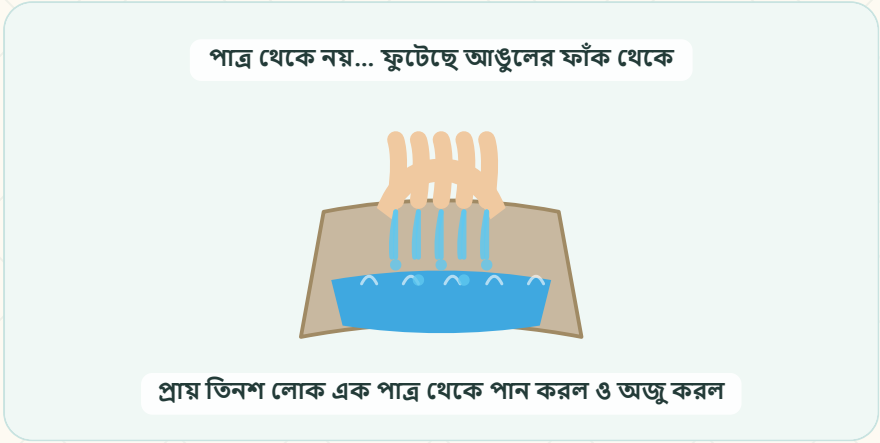

এমন এক দৃশ্য, যা আনাস ইবনে মালিক, জাবির, ইবনে মাসউদসহ অনেকে বর্ণনা করেছেন

সহজ কথায়

পানি ফুরিয়ে গিয়েছিল, মানুষ তৃষ্ণার্ত। নবী ﷺ একটি ছোট পাত্রে হাত রাখলেন, **আর তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরনার মতো পানি ফুটে বেরোতে লাগল** — এমনকি গোটা বাহিনী পান করল আর অজু করল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সেই জায়গায় না ছিল কোনো কূপ, না কোনো বৃষ্টি। মরুভূমিতে পানি জীবন-মরণের প্রশ্ন। শত শত মানুষের একই সময়ে পানি দরকার। আর ছোট একটি পাত্র তো একজন মানুষের অজু আর পানের জন্যও যথেষ্ট হতো না।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** আনাস ইবনে মালিক, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদসহ অনেকের সূত্রে বর্ণিত, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় — হুদাইবিয়ায়, তাবুকে ও অন্যত্র। এটি একাধিকবার ঘটেছে, আর হাজার হাজার মানুষ তার সাক্ষী। ইবনে মাসউদ বলেন: "আমরা নিদর্শনগুলোকে বরকত গণ্য করতাম, আর আপনারা সেগুলোকে ভয়ের বিষয় গণ্য করেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম, পানি কমে গেল; তিনি বললেন: অবশিষ্ট কিছু পানি খুঁজে দেখো..."

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

পার্থক্য গড়ে দেওয়া বিবরণটি হলো ফোয়ারার জায়গা: **"তাঁর আঙুলের ফাঁক দিয়ে"**, পাত্র থেকে নয়। কেউ যদি একটি সংবাদ বানাতে চাইত, তবে কাছের কথা হতো এই বলা যে পাত্রটি ভরে গেল — তা অনেক সহজ। কিন্তু মানুষের হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে পানি ফুটে ওঠা এমন এক অদ্ভুত ও সূক্ষ্ম বর্ণনা, যা চোখে না দেখে বলাই যায় না। আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ **সাক্ষীর সংখ্যা**: আনাসের বর্ণনায় "প্রায় তিনশ", আর হুদাইবিয়ার দিনে জাবিরের বর্ণনায় এক হাজার চারশ। এত মানুষের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া, তারপর বর্ণিত ও লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়া একটি সংবাদ, যাদের একজনও তা অস্বীকার করেননি — তা তাঁদের পরে বানানো হয়েছে, এমন হতেই পারে না।

খাবারে বরকত

১১৪ এক সা' যব, যা হাজার মানুষকে পেট ভরে খাওয়াল

আমি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম ... তিনি বললেন: খন্দকের লোকদের ডাকো। আর তারা ছিল এক হাজার ... তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, তারা খেয়েছে, এমনকি তা রেখেই ফিরে গেছে, আর আমাদের হাঁড়ি তখনো তেমনই টগবগ করে ফুটছিল।

বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন — মুত্তাফাক আলাইহি

খন্দকের দিন — যখন মানুষ ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে রাখত

সহজ কথায়

জাবির নবী ﷺ-কে সামান্য খাবারের দাওয়াত দিলেন, যা কয়েকজনের জন্যই কেবল যথেষ্ট ছিল; আর নবী ﷺ ডেকে আনলেন খন্দক খননরত এক হাজার মানুষকে। **সবাই পেট ভরে খেল, আর হাঁড়ি তখনো কানায় কানায় ভরা।**

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এ ছিল অবরোধের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলোর কথা। মুসলিমরা ক্ষুধার্ত, এমনকি নবী ﷺ নিজেই ক্ষুধায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। খাবার ছিল এক সা' যব আর একটি ছোট বকরির বাচ্চা — এক ঘরের জন্যই কেবল যথেষ্ট। আর জাবির নিজের কাজের জন্য স্ত্রীর কাছে গোপনে ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পূর্ণ হাদিসটি **সহিহ বুখারিতে** আছে; জাবির ইবনে আবদুল্লাহ নিজের ও নিজের অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন, ঘরোয়া সূক্ষ্ম বিবরণসহ: স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, লজ্জায় পড়ার ভয়, হাঁড়ি আগুন থেকে না নামানোর ব্যাপারে নবী ﷺ-এর নিষেধ, আর তা থেকে তুলে তুলে বণ্টনের নির্দেশ — ঢাকনা না খোলারও নির্দেশ। শেষে জাবির কসম করে বলেন: "তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, তারা খেয়েছে, এমনকি তা রেখেই ফিরে গেছে, **আর আমাদের হাঁড়ি তখনো তেমনই টগবগ করে ফুটছিল**" — অর্থাৎ তখনো ভরা অবস্থায় ফুটছিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এমন ঘটনা বানানো যায় না, কারণ তা ঘটেছে এক জায়গায়, এক সময়ে, **এক হাজার সাক্ষীর** সামনে। এটি মিথ্যা হলে বাহিনীর শত শত মানুষ তা অস্বীকার করত, আর তাদের মধ্যে ওত পেতে থাকা মুনাফিকরাও ছিল। তার চেয়েও সূক্ষ্ম কথা: বর্ণনাকারী নিজেই **নিজের অস্বস্তির** কথা বলছেন, খাবার কম পড়ার ভয়ের কথা বলছেন — নিজের বড়ত্ব প্রচার করতে চাওয়া কোনো রচয়িতা এমন বিবরণ কখনোই জুড়ত না। আর সহিহ গ্রন্থগুলোতে এর অনুরূপ ঘটনা বহু: তাবুকের খাবার, ইবনুল জাররাহর খেজুর, আর জাবিরের পিতার সেই ঋণ, যা এমন খেজুর দিয়ে শোধ হয়েছিল যা তার দশ ভাগের এক ভাগও ঢাকত না।

115

জড়বস্তুর কান্না

যে খেজুরকাণ্ড তাঁর জন্য কেঁদে উঠেছিল

মসজিদের ছাদ ছিল খেজুরগাছের কাণ্ডের ওপর, আর নবী ﷺ যখন খুতবা দিতেন তখন সেগুলোরই একটি কাণ্ডের পাশে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বার তৈরি করা হলো ... তখন আমরা সেই কাণ্ড থেকে গর্ভবতী উটনীর কাতরানোর মতো একটি আওয়াজ শুনলাম, যতক্ষণ না নবী ﷺ এসে তার ওপর নিজের হাত রাখলেন, আর তা শান্ত হয়ে গেল।

বুখারি বর্ণনা করেছেন — সহিহ

একটি খেজুরকাণ্ড, যা দশম মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো কাতরেছিল

সহজ কথায়

নবী ﷺ একটি খেজুরকাণ্ডে ঠেস দিয়ে খুতবা দিতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বার বানানো হলো, **কাণ্ডটি কেঁদে উঠল আর কাতরাল** — এমনকি মসজিদের প্রত্যেকেই তা শুনল; তখন তিনি ﷺ নেমে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, আর তা শান্ত হলো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কাণ্ড তো শুকনো এক টুকরো কাঠ, তাতে কোনো অনুভূতি নেই। তার ভেতর থেকে দশম মাসের গর্ভবতী উটনীর মতো শোনা যায় এমন আওয়াজ বেরোনোর কোনো তুলনাই নেই। আর সেদিন মসজিদ ছিল মানুষে ভরা, আর দিনটি ছিল জুমার।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ বুখারিতে** ও অন্যত্র আছে, আর বহু সনদে অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত: জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, আনাস ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, উবাই ইবনে কাব, সাহল ইবনে সাদ, বুরাইদা ও অন্যরা — এমনকি আলেমগণ একে **মুতাওয়াতির** বর্ণনার মধ্যে গণ্য করেছেন। হাসান বসরি এটি বর্ণনা করার সময় বলতেন: "হে মুসলিমগণ! এক টুকরো কাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ভালোবাসায় কাতর হয়; আপনারা তো তাঁর জন্য কাতর হওয়ার অধিক হকদার।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

যুক্তির জোর এখানে এই যে, ঘটনাটি ঘটেছে **মদিনার মসজিদে জুমার দিনে** — অর্থাৎ শহরের সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক সমাবেশের সামনে, কোনো নির্জনে নয়, গুটিকয় মানুষের সামনেও নয়। বহু সাহাবি এটি বর্ণনা করেছেন, প্রত্যেকে নিজের ভাষায়; আর আওয়াজটির বর্ণনা তাঁরা প্রায় একই রকম শব্দে দিয়েছেন — "গর্ভবতী উটনীর কাতরানোর মতো"। আর শেষ বিবরণটিই সংবাদটিকে কল্পনার ঊর্ধ্বে তুলে দেয়: **তিনি হাত রাখতেই তা শান্ত হয়ে গেল**; এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন: "আমি যদি তাকে জড়িয়ে না ধরতাম, তবে সে কিয়ামত পর্যন্ত কাতর হতেই থাকত।" এমন এক সংবাদ, যার সাক্ষী গোটা একটি মসজিদ, তারপর যা বর্ণনা করেছেন কয়েক ডজন সাহাবি, আর উপস্থিতদের কেউই তা অস্বীকার করেননি।

ইসরা ও মিরাজ

১১৬ তিনি বাইতুল মাকদিসের বর্ণনা দিলেন, অথচ কখনো তা দেখেননি

পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশে আমরা বরকত রেখেছি।

সূরা আল-ইসরা — আয়াত 1

তিনি সকালে কুরাইশকে জানালেন, আর তারা মসজিদটির দরজা ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করল

সহজ কথায়

নবী ﷺ-কে রাতের বেলায় মক্কা থেকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি কুরাইশকে জানালে তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল **আর তাঁর কাছে মসজিদটির বর্ণনা চাইল** — অথচ তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যারা তা দেখেছিল। তিনি তাদের বর্ণনা দিলেন, শেষে তারা বলল: "বর্ণনার কথা বলতে গেলে, তা তিনি ঠিকই বলেছেন।"

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

মক্কা আর বাইতুল মাকদিসের দূরত্ব প্রায় 1,200 কিলোমিটার; কাফেলা এক দিকে যেতে এক মাস নেয়, ফিরতেও তেমনই। আর নবী ﷺ **জীবনে কখনো বাইতুল মাকদিস দেখেননি**। অথচ মক্কায় এমন বহু বণিক ছিল, যারা শামে গিয়েছে, মসজিদটি দেখেছে আর তার নিদর্শনগুলো চেনে। তাই চ্যালেঞ্জটি ছিল তার সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপে: **এমন এক জায়গার বর্ণনা দেওয়া, যা আপনার বিরোধীরা চেনে আর আপনি চেনেন না**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** ও অন্যত্র আছে। বুখারি ও মুসলিম জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে নবী ﷺ বলেছেন: "কুরাইশ যখন আমাকে মিথ্যাবাদী বলল, আমি হিজরে দাঁড়ালাম; তখন আল্লাহ বাইতুল মাকদিস আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন, **আর আমি তা দেখতে দেখতেই তাদের কাছে তার নিদর্শনগুলোর বর্ণনা দিতে লাগলাম**।" আরেক বর্ণনায় আছে, তারা তাঁকে তার দরজার সংখ্যা জিজ্ঞাসা করল, আর তিনি গুনে গুনে বলে দিলেন। এরপর তিনি তাদের পথে থাকা তাদেরই একটি কাফেলার খবর দিলেন, তার বর্ণনা দিলেন আর পৌঁছানোর সময়ও বলে দিলেন — আর তা এল ঠিক যেমনটি তিনি বলেছিলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এ এক **তাৎক্ষণিক, সরাসরি ও মিথ্যা প্রমাণযোগ্য পরীক্ষা**, তাও একই মজলিসে। তাঁকে অনুপস্থিত ও অজ্ঞেয় কোনো কিছুর বর্ণনা দিতে বলা হয়নি, বরং এমন এক জায়গার, **যা প্রশ্নকারীরা চেনে** আর তিনি চেনেন না। একটিমাত্র বিবরণে একটিমাত্র ভুলই সেদিনই গোটা দাওয়াতকে ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তারা বর্ণনার নির্ভুলতা স্বীকার করল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল — প্রতিটি নিদর্শনের বেলায় যা ছিল তাদের অভ্যাস। তবে সবচেয়ে জোরালো সাক্ষ্য **কাফেলার খবর**: তিনি তাদের নিজেদের কাফেলার খবর দিলেন — কোথায় আছে, কখন পৌঁছাবে; তারা অপেক্ষা করল, আর তাঁর কথামতোই, তিনি যেদিন বলেছিলেন সেদিনই তা পেল। এ এক স্বাধীন যাচাই, যা তাদের নিজেদের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে, তাঁর হাতে নয়।

১১৭ নিহতেরা কোথায় পড়বে, যুদ্ধেরও আগে

রাসূলুল্লাহ ﷺ আগের দিনই আমাদের দেখাচ্ছিলেন, বদরের লোকেরা কোথায় লুটিয়ে পড়বে; তিনি বলছিলেন: আল্লাহ চাহে তো আগামীকাল অমুক এখানে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন: তাদের একজনও রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে হাত রেখেছিলেন সে জায়গা থেকে সরেনি।

মুসলিম বর্ণনা করেছেন — সহিহ

বালুতে আঁকা জায়গাগুলো... লাশগুলো সেখানেই পাওয়া গেল

সহজ কথায়

বদর যুদ্ধের একদিন আগে নবী ﷺ রণক্ষেত্রে হেঁটে বেড়ালেন, হাত দিয়ে মাটির জায়গাগুলোর দিকে ইশারা করে বলতে লাগলেন: **এখানে অমুক নিহত হবে, আর এখানে অমুক**। যুদ্ধ যখন হলো, তাদের একজনও তিনি যে জায়গা দেখিয়েছিলেন তা পেরিয়ে যায়নি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বদর ছিল প্রথম বড় মোকাবিলা: মুসলিম তিনশর কিছু বেশি, আর মুশরিক প্রায় এক হাজার। কে জিতবে তা-ই কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারত না, নিহতদের নাম আর তাদের লুটিয়ে পড়ার জায়গা নির্দিষ্ট করা তো দূরের কথা। যুদ্ধে মানুষ নড়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ে, পালায়; তাই **প্রত্যেক মানুষ মাটির ঠিক কোন টুকরোয় লুটিয়ে পড়বে** তা নির্ধারণ করে দেওয়ার কোনো তুলনাই নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ মুসলিমে** আনাস ইবনে মালিক ও উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। আনাসের বর্ণনায়: "তিনি বলতে লাগলেন: আগামীকাল অমুক এখানে পড়বে — আর তিনি এখানে-ওখানে মাটিতে হাত রাখলেন। বর্ণনাকারী বলেন: **তাদের একজনও রাসূলুল্লাহ ﷺ যেখানে হাত রেখেছিলেন সে জায়গা থেকে সরেনি।**" আরও প্রমাণিত যে, যুদ্ধের পর তিনি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নাম ধরে ধরে ডাকছিলেন: "হে অমুকের পুত্র অমুক, তোমাদের রব তোমাদের যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তোমরা কি তা সত্য পেয়েছ?"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এখানে ভবিষ্যদ্বাণীটি **ঘটার আগেই মাটিতে লিখে রাখা হয়েছে**, আর গোটা বাহিনী তা দেখেছে। আর সব সংবাদের মধ্যে এটিই সবচেয়ে সহজে মিথ্যা প্রমাণযোগ্য: একজন মানুষ অন্য কোথাও পড়ে গেলেই তিনশ সাক্ষীর সামনে গোটা ব্যাপারটি ভেঙে পড়ত। আর এতে তিনটি জিনিস একসঙ্গে ছিল: **ব্যক্তিদের নাম ধরে নির্দিষ্ট করা**, **তারা নিহত হবেই বলে দেওয়া** — অর্থাৎ ছোট দলটিই জিতবে — এবং **জায়গাটি বিঘতের মাপে ঠিক করে দেওয়া**। একটিমাত্র সংবাদে তিনটি শর্ত, আর পরদিনই দুই বাহিনীর চোখের সামনে সবগুলোই পূর্ণ হলো।

একটি পশুর অভিযোগ

১১৮ যে উট কেঁদেছিল ও অভিযোগ করেছিল

যখন সে নবী ﷺ-কে দেখল, সে গোঙাল আর তার দুই চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরল। তখন নবী ﷺ তার কাছে গিয়ে কানের পেছনে হাত বুলালেন, আর সে চুপ হয়ে গেল। তিনি বললেন: এই উটের মালিক কে? ... তুমি কি এই পশুটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, যাকে আল্লাহ তোমার মালিকানায় দিয়েছেন? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো আর খাটিয়ে ক্লান্ত করো।

আবু দাউদের বর্ণনা — আলবানি সহিহ বলেছেন

উটটি হেঁটে তাঁর কাছে এল আর তার দুই চোখ বেয়ে পানি ঝরছিল — সাহাবিদের চোখের সামনে

সহজ কথায়

নবী ﷺ আনসারের এক ব্যক্তির প্রাচীরঘেরা বাগানে প্রবেশ করলেন, আর একটি উট **কাঁদতে কাঁদতে** তাঁর কাছে এল। তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন, তাতে সে শান্ত হলো। তারপর তিনি তার মালিককে ডেকে বললেন: **"সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখো আর খাটিয়ে ক্লান্ত করো।"**

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

পশু অভিযোগ করে না, আর তার কথা কেউ বোঝেও না। আর কোনো মানুষের সঙ্গে তার উটের সম্পর্ক সে দুজনেরই ভেতরকার ব্যক্তিগত ব্যাপার; নির্জনে সে তার সঙ্গে কেমন আচরণ করে তা কেউ জানে না। তাই এই বর্ণনায় একসঙ্গে দুটি জিনিস রয়েছে: **একটি পশুর অভিযোগ বোঝা**, আর **এমন এক গোপন কথা জানা যা কেবল তার মালিকই জানে**।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আর আলবানি ও অন্যরা একে সহিহ বলেছেন। সহিহ গ্রন্থগুলোতে এর প্রতিষ্ঠিত সমান্তরাল বর্ণনাও আছে: **খায়বারের বিষমাখা বকরির** হাদিস, যাতে আছে যে সামনের রানটি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল সেটি বিষাক্ত, তাই তিনি হাত তুলে নিলেন আর সঙ্গীদেরও হাত তুলে নিতে বললেন (আবু দাউদ ও দারিমি, আর ঘটনার মূল দুই সহিহ গ্রন্থে), এবং **যে নেকড়ে রাখালের সঙ্গে কথা বলেছিল** তার হাদিস, যেখানে সে নবী ﷺ-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছিল (আহমদের বর্ণনা, সহিহ সাব্যস্ত)। আরবরা এ ধরনের কিছুই জানত না, বরং তারা একে অভাবনীয় মনে করত।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

ঘটনাটির ব্যবহারিক ফলই একে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। নবী ﷺ নিদর্শন দেখিয়েই থেমে যাননি, বরং তাকে **পশুর প্রতি দয়ার একটি বিধানে** রূপ দিয়েছেন: "তুমি কি এই পশুটির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো না, যাকে আল্লাহ তোমার মালিকানায় দিয়েছেন?" আর এটি তাঁর আমলের একটি পূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গেই মেলে: পশুকে কষ্ট দেওয়া আর তাকে নিশানা বানানোর নিষেধ, যে নারী একটি বিড়াল আটকে রেখে আগুনে গিয়েছিল তার হাদিস, আর যে ব্যক্তি একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা পেয়েছিল তার কথা। সপ্তম খ্রিস্টাব্দে, পশুর প্রতি উদাসীন এমন এক পরিবেশে এর আসা — আর পৃথিবীর প্রথম পশু-নিষ্ঠুরতা নিবারণী সংস্থার এক হাজার বছরেরও বেশি আগে — আরেকটি নিদর্শন।

১১৯ যে বিষমাখা বকরি তাঁকে জানিয়ে দিল

খায়বারে এক ইহুদি নারী তাঁকে একটি ভুনা বকরি উপহার দিল, যাতে সে বিষ মিশিয়েছিল ... তিনি তা থেকে এক গ্রাস নিলেন, কিন্তু গিললেন না আর বললেন: এই হাড়টি আমাকে জানাচ্ছে যে তা বিষাক্ত।

আবু দাউদ ও দারিমির বর্ণনা — সনদ হাসান, আর এর মূল দুই সহিহ গ্রন্থে

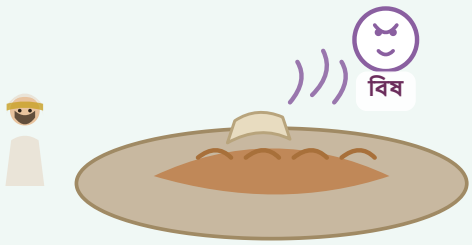

এক নারী তাঁকে পরখ করতে চেয়েছিল: নবী হলে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে, বাদশাহ হলে আমরা রেহাই পাব

সহজ কথায়

এক ইহুদি নারী নবী ﷺ-কে একটি ভুনা বকরি উপহার দিল, যাতে সে বিষ মিশিয়ে রেখেছিল। তিনি এক গ্রাস মুখে নিয়ে **তা গিললেন না**, আর বললেন: "এই সামনের রানটি আমাকে জানাচ্ছে যে তা বিষাক্ত।"

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

এটি ছিল খায়বার বিজয়ের পরের ঘটনা, শত্রুতা তখন প্রকাশ্য ও সক্রিয়। আর ভুনা মাংসে মেশানো বিষ চোখে দেখে বা গন্ধ শুঁকে ধরা যায় না। আর সেই নারী নিজেই জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেছিল যে সে জানতে চেয়েছিল — **"তিনি নবী হলে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হবে, আর বাদশাহ হলে আমরা তাঁর হাত থেকে রেহাই পাব"**। অর্থাৎ সে বিষয়টিকে একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা হিসেবেই সাজিয়েছিল।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

ঘটনাটি **সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে** এবং সুনানে আবু দাউদ ও দারিমিতে রয়েছে, আনাস, আবু হুরায়রা, জাবির, ইবনে আব্বাস ও অন্যদের সূত্রে। এর ভেতরেই সেই নারীর নিজের স্বীকারোক্তি ও এ কাজে তার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। আর বিশর ইবনুল বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যান, কারণ সতর্কবাণীর আগেই তিনি নিজের গ্রাসটি গিলে ফেলেছিলেন — এমন বিবরণ কোনো জালিয়াত যোগ করত না, কেননা তা দেখায় যে নিদর্শনটি সব ক্ষতি ঠেকায়নি।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই ঘটনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, **পরীক্ষাটি সাজিয়েছিল প্রতিপক্ষ নিজেই**, আর আগেভাগেই সে তার শর্ত ঘোষণা করেছিল: নবুয়ত চেনা যাবে এভাবে যে তাঁকে বিষের সংবাদ দেওয়া হবে। তারপর শর্তটি হুবহু পূর্ণ হলো, আর সে নিজে লোকদের সামনে তা স্বীকার করল। এরপর বিষয়টি আরও ভারী হলো: **নবী ﷺ তাকে ক্ষমা করে দিলেন** — সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলোতে — আর এ আচরণ নিশ্চিন্ত মানুষের, ভীত প্রতিশোধপরায়ণের নয়। আর যে শেষ বিবরণটি বর্ণনার সততা চূড়ান্ত করে দেয় তা হলো সেই বিষে **এক সাহাবির মৃত্যুর** উল্লেখ; বর্ণনা ঘটনাটিকে সাজিয়ে তোলেনি, একে পূর্ণ বিজয়ও বানায়নি, বরং তার মিষ্টির সঙ্গে তিক্ততাসহই তুলে ধরেছে।

কবুল হওয়া দোয়া

১২০ যে বৃষ্টি চাওয়ায় নামল, আবার চাওয়ায় থামল

তিনি দুই হাত তুলে বললেন: হে আল্লাহ, আমাদের বৃষ্টি দান করুন ... আল্লাহর কসম, আকাশে আমরা এক টুকরো মেঘও দেখছিলাম না ... আর তিনি হাত নামাতে না নামাতেই পাহাড়ের মতো মেঘ উঠে এল, আর তিনি নামতে না নামতেই বৃষ্টি তাঁর দাড়ি বেয়ে ঝরছিল।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা — সর্বসম্মত

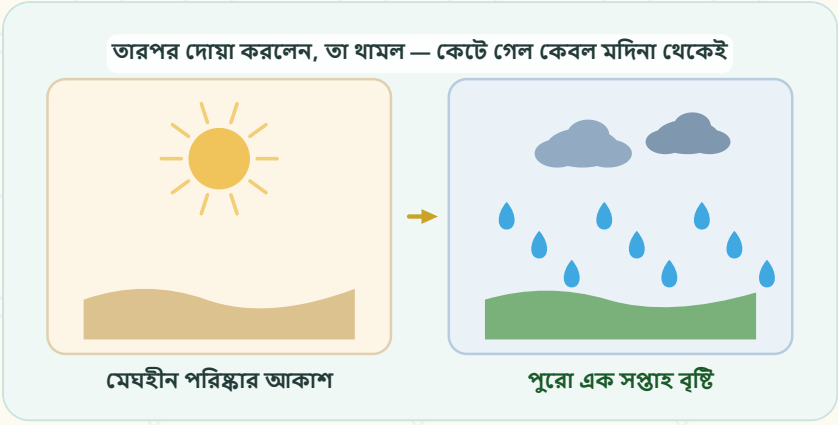

মদিনা রোদের নিচে, আর তার চারপাশে সবখানে বৃষ্টি — আনাস যেমন বর্ণনা করেছেন

সহজ কথায়

জুমার খুতবার সময় এক ব্যক্তি খরার অভিযোগ নিয়ে এল, তখন নবী ﷺ দুই হাত তুলে দোয়া করলেন — **আকাশ তখন পরিষ্কার, এক টুকরো মেঘও নেই**। তিনি হাত নামাতে না নামাতেই মেঘ উঠে এল, আর পুরো এক সপ্তাহ বৃষ্টি হলো, শেষে লোকেরা বেশি বৃষ্টির অভিযোগ করল; তিনি দোয়া করলেন, আর তা থেমে গেল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

বৃষ্টির প্রার্থনা জাতিগুলোর ভেতর প্রাচীন এক রীতি, কিন্তু তা আশা-করা এক প্রার্থনা, পূর্ণ হওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি নয়। আর পরিষ্কার আকাশ থেকে মুহূর্তের ভেতর বৃষ্টি নামে না। আর এটি **দুইবার, দুই বিপরীত দিকে** ঘটা — চাওয়ায় নামা, তারপর চাওয়ায় থেমে যাওয়া — কাকতালের সব সম্ভাবনার বাইরে চলে যায়।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আনাস দৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন বিস্ময়কর নিখুঁততায়: আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিষ্কার, মেঘ উঠেছিল "পাহাড়ের মতো", আর বৃষ্টি চলেছিল পরের জুমা পর্যন্ত। তারপর যখন তিনি তা উঠে যাওয়ার দোয়া করলেন, আনাস বলেন: **"তা থেমে গেল, আর আমরা রোদে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে এলাম"**, আর অন্য এক বর্ণনায়: "কাপড় সরে যাওয়ার মতো তা মদিনা থেকে সরে গেল" — অর্থাৎ বৃষ্টি **কেবল** মদিনা থেকেই সরে গেল আর তার চারপাশে থেকে গেল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

শেষ বিবরণটিই এই সংবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক। দোয়ার পর বৃষ্টি নামা নিয়ে বলা যেত: তা তার মৌসুমের সঙ্গেই মিলে গেছে। কিন্তু **কেবল মদিনা থেকেই তার সরে যাওয়া আর চারপাশে থেকে যাওয়া** এমন এক ঘটনা যা কাকতাল দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, আর মদিনার সব মানুষ একই দিনে তা নিজের চোখে দেখেছে। আর দ্বিতীয় দোয়ার শব্দগুলো লক্ষ করুন, সেগুলো অত্যন্ত নিখুঁত: "**হে আল্লাহ, আমাদের চারপাশে, আমাদের উপরে নয়**" — তিনি বৃষ্টি একেবারে উঠে যাওয়ার কথা বলেননি, বরং তা মদিনা থেকে ফিরিয়ে তার চারপাশে দেওয়ার কথা বলেছেন, কারণ মানুষের তা প্রয়োজন ছিল। আর তা ঠিক সেই নিখুঁত রূপেই ঘটল যে রূপে তিনি চেয়েছিলেন।

আরোগ্য

১২১ আলির চোখ — আর কাতাদার চোখ

তিনি তাঁর দুই চোখে থুতু লাগিয়ে দোয়া করলেন, আর তিনি এমন সুস্থ হলেন যেন কোনো ব্যথাই ছিল না।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা — সর্বসম্মত

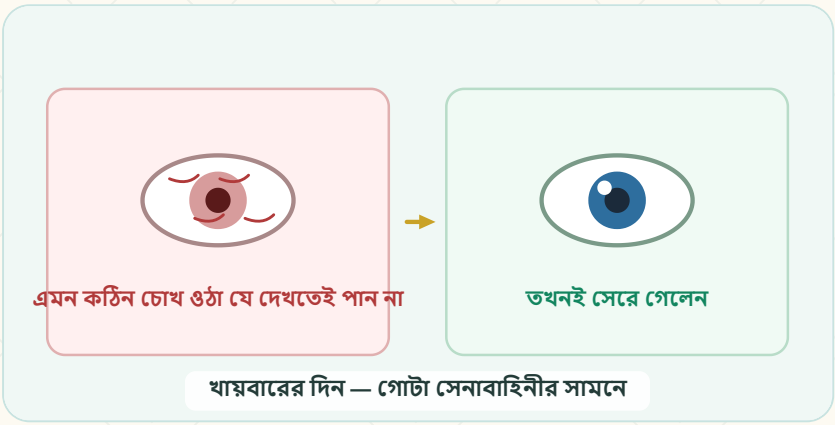

আলির চোখ এতটাই ফুলে ছিল যে তিনি প্রায় দেখতেই পাচ্ছিলেন না; কিছুক্ষণ পরেই পতাকা তাঁর হাতে

সহজ কথায়

খায়বারের দিনে নবী ﷺ বললেন: **আগামীকাল আমি পতাকা এমন একজনকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে**। তিনি আলিকে ডাকলেন — যাঁর দুই চোখ এমন অসুস্থ ছিল যে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না — **আর তাঁর দুই চোখে থুতু লাগালেন, তাতে তিনি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন**, এরপর তাঁরই হাতে খায়বার বিজিত হলো।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

চোখ ওঠা সেই পরিবেশের এক পরিচিত রোগ ছিল, আর ধৈর্য ও সময় ছাড়া তার কোনো চিকিৎসা ছিল না। তা মুহূর্তের ভেতর সারে না। আর ঘটনাটি ঘটেছিল এক উত্তেজনাপূর্ণ সামরিক মুহূর্তে, সেনাদল অপেক্ষায় ছিল, পতাকা কে বহন করবে তা জানতে উন্মুখ — উমর বলেছেন: "সেদিন ছাড়া আমি কখনো নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি।"

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে** সাহল ইবনে সাদ, আবু হুরায়রা ও সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। আর এর সমান্তরাল হলো উহুদের দিনে **কাতাদা ইবনে নুমান** রাদিয়াল্লাহু আনহুর চোখ সম্পর্কে যা প্রতিষ্ঠিত — তাঁর চোখে এমন আঘাত লাগে যে তা গাল পর্যন্ত ঝুলে পড়ে, আর নবী ﷺ নিজ হাতে তা যথাস্থানে বসিয়ে দেন ও তাঁর জন্য দোয়া করেন, তাতে সেটিই তাঁর দুই চোখের ভেতর সুন্দরতর ও তীক্ষ্ণতর হয়ে যায়। এ কথা তাঁর বংশে জানা ছিল, এমনকি তাঁর নাতি খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের সামনে তা উল্লেখ করেছিলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

দুটি বিষয় এই ঘটনাকে নিছক দাবির গণ্ডি থেকে বের করে আনে। প্রথমত, এটি ঘটেছিল **সৈন্য সমাবেশের মুহূর্তে একটি পূর্ণ সেনাদলের সামনে**, যখন প্রতিটি চোখ ছিল পতাকাবাহীর উপর। দ্বিতীয়ত — আর এটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ — আরোগ্য নিজেই কোনো লক্ষ্য ছিল না, বরং তা ছিল **একটি দায়িত্ব পালনের শর্ত**: পতাকা তাঁকে তখনই দেওয়া হলো, তিনি যুদ্ধে বেরিয়ে গেলেন, আর সেই দিনেই তাঁর হাতে দুর্গ জয় হলো। তিনি সত্যিই সুস্থ না হলে ঘণ্টাখানেকের ভেতরেই তা ধরা পড়ত। আর কাতাদার চোখের চিহ্ন **কয়েক দশক ধরে দৃশ্যমান ছিল** — এমন এক নিদর্শন যা মানুষ সারা জীবন সেই ব্যক্তির মুখে দেখেছে, নিছক বর্ণিত কোনো সংবাদ নয়।

হিজরতে সুরক্ষা

122 সুরাকা আর তার ঘোড়া, যা মাটিতে ডেবে গেল

আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে চলছিলাম ... আমার ঘোড়া হোঁচট খেল আর আমি পড়ে গেলাম ... তারপর আবার সওয়ার হলাম, আর যখন তাঁরা দুজন নজরে এলেন তখন তার সামনের দুই পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ডেবে গেল।

বুখারির বর্ণনা — সহিহ

একশ উটের লোভে বেরোনো এক পিছুধাওয়াকারী... ফিরল নিরাপত্তা চাইতে

সহজ কথায়

হিজরতের সময় সুরাকা নবী ﷺ ও আবু বকরের পিছু নিয়ে বেরোল। আর যতবারই সে তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছত, **তার ঘোড়ার পা শক্ত মাটিতে ডেবে যেত** হাঁটু পর্যন্ত। সে বুঝল যে তাকে ঠেকানো হচ্ছে, আর তাঁদের কাছে নিরাপত্তা চাইল।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

কুরাইশ ঘোষণা করেছিল, যে মুহাম্মদ ﷺ-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে তার জন্য একশ উট। আর সুরাকা ছিল বনু মুদলিজের এক দক্ষ, অভিজ্ঞ অশ্বারোহী — সেই গোত্র পদচিহ্ন পড়া ও খোঁজ লাগানোয় পারদর্শী। দৃশ্যটি ছিল খোলা মরুভূমিতে, পালানোর কোনো জায়গা নেই, আর দুজন মানুষের কোনো পাহারা নেই।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

পূর্ণ বিবরণসহ কাহিনিটি **সহিহ বুখারিতে** আছে, আয়েশা ও আবু বকর থেকে আসা হিজরতের দীর্ঘ হাদিসের ভেতর, আর **সুরাকা নিজেই তা বর্ণনা করে** ইসলাম গ্রহণের পর। সে জানিয়েছে যে তার নিচে ঘোড়া একাধিকবার ডেবে গিয়েছিল, যে সে তির দিয়ে ভাগ্যগণনা করেছিল আর অপছন্দের ফলটিই এসেছিল, তবু সে তা অমান্য করেছিল — এরপর যখন সে নিরাশ হলো, তখন ডেকে নিরাপত্তার প্রস্তাব দিল আর তাঁদের পাথেয় ও সামগ্রী দিতে চাইল। নবী ﷺ তার জন্য নিরাপত্তার একটি পত্র লিখিয়ে দিলেন, যা সে মক্কা বিজয়ের দিনে নিয়ে এসেছিল। আর সেই মুহূর্তেই তিনি ﷺ তাকে বলেছিলেন: "তোমার কী অবস্থা হবে যখন তুমি কিসরার দুই বালা পরবে?" — যা সে পরে পরেছিল।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এই সংবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, **এর বর্ণনাকারী প্রতিপক্ষ নিজেই**। ঘটনার দিন সুরাকা মুসলিম ছিল না; সে ছিল পুরস্কারলোভী পিছুধাওয়াকারী। বছর কয়েক পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে আর তার সঙ্গে যা ঘটেছিল তা মানুষকে বলে। আর প্রতিপক্ষের নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য — নিজের ব্যর্থতা আর যা সে দেখেছে তা স্বীকার করা — বর্ণনাশাস্ত্রের পণ্ডিতদের কাছে প্রমাণের সর্বোচ্চ স্তরগুলোর একটি। আর সেই অদ্ভুত বিবরণটিও লক্ষ করুন যা কেউ বানায় না: ঘোড়া **একবার নয়, বারবার ডেবে গিয়েছিল**, আর প্রতিবারই সে আবার চেষ্টায় ফিরে গিয়েছিল, শেষে গিয়ে নিরাশ হয়েছিল। কোনো পিছুধাওয়াকারী কাহিনি বানালে হত্যাচেষ্টার এই বারবার একগুঁয়েমিসহ তা কখনো বর্ণনা করত না।

নবুয়তের নিদর্শন

১২৩ সালমান ফারসি ও তিনটি নিদর্শন

আর সে আমাকে তাঁর বর্ণনা দিল: তিনি সদকা খান না, হাদিয়া গ্রহণ করেন, আর তাঁর দুই কাঁধের মাঝে নবুয়তের মোহর আছে।

আহমদ ও ইবনে হিব্বানের বর্ণনা — সনদ হাসান

তিন নিদর্শন, যা তিনি নিজে যাচাই করেছেন

- তাঁকে সদকা দিলেন... তিনি খেলেন না
- তাঁকে হাদিয়া দিলেন... তিনি সঙ্গে খেলেন
- পিঠ দেখলেন, নবুয়তের মোহর পেলেন

সেই মজলিসেই মুসলিম হলেন

এক ব্যক্তি, যিনি এই তিন নিদর্শনের খোঁজে পারস্য ও শাম পেরিয়েছেন

নবুয়তের আগে এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর কাছে শোনা নিদর্শন... পরে তা মিলে গেল

সহজ কথায়

সালমান ফারসি নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম ছেড়ে সত্যের খোঁজে দেশে দেশে ঘুরেছেন, শেষে এক সন্ন্যাসী তাঁকে প্রতীক্ষিত নবীর তিনটি নিদর্শন বলে দেন। মদিনায় পৌঁছে **তিনি তিনটি নিদর্শনই নিজে পরখ করে মিলিয়ে নেন** — আর ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের আহলে কিতাব আরবের ভূমিতে প্রেরিত হতে যাওয়া এক নবীর অপেক্ষায় ছিল, আর তাঁর নিদর্শনগুলো তারা প্রজন্মে প্রজন্মে বয়ে নিচ্ছিল। সালমান পারস্য থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ বছর সন্ন্যাসীদের মাঝে ঘুরেছেন, শেষে দাস হিসেবে বিক্রি হয়ে মদিনায় পৌঁছান — হিজরতের কয়েক বছর আগে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

কাহিনিটি সালমান নিজেই বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আহমদ, সহিহ ইবনে হিব্বান ও ইবনে ইসহাকের সিরাতে। তাতে আছে, তিনি কিছু খেজুর এনে বললেন: এটি সদকা। নবী ﷺ সঙ্গীদের বললেন: "খাও", আর নিজে খেলেন না। তারপর তিনি অন্য খেজুর এনে বললেন: এটি হাদিয়া। আর তিনি তাঁদের সঙ্গে খেলেন। এরপর সালমান দেখার জন্য তাঁর পেছন দিকে ঘুরলেন, আর নবী ﷺ বুঝে নিলেন তিনি কী চান, তাই পিঠ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন; সালমান মোহর দেখলেন আর তার উপর ঝুঁকে পড়ে চুমু খেতে ও কাঁদতে লাগলেন।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি কোনো মহাজাগতিক অলৌকিকতা নয়, বরং সব অর্থেই **একটি সুসংগঠিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা**: আগেভাগে নির্দিষ্ট করা অনুমান, প্রতিটির জন্য একটি পরীক্ষণ, আর একটি ফল যা গ্রহণ বা বর্জন করা যায়। সালমান কোনো যুক্তি বা আবেগে ইসলাম গ্রহণ করেননি, বরং **তিনটি শর্তই পূর্ণ হওয়ার** পরে করেছেন। আর এগুলোর ভেতর সূক্ষ্মতম হলো দ্বিতীয়টি: **সদকা ও হাদিয়ার** পার্থক্য — এটি নবী ﷺ-এর জন্য নির্দিষ্ট একটি শরয়ি বিধান (সদকা তাঁর জন্য হারাম, হাদিয়া হালাল), আর অনুমান করে কারও পক্ষে এতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। কয়েকটি বর্ণনায় এসেছে যে সন্ন্যাসী, ইহুদি পণ্ডিত ও হানিফরা নবুয়তের আগেই এক প্রতীক্ষিত নবীর কথা বলতেন ও তাঁর নিদর্শন বর্ণনা করতেন — তাঁদের ভেতর বাহিরা সন্ন্যাসী, আর জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, যিনি নবুয়তের আগেই ইবরাহিমের ধর্ম খুঁজতে খুঁজতে মারা যান। এরপর ইহুদি পণ্ডিত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মদিনায় তাঁর আগমনের প্রথম দিনেই তাঁকে চিনে ফেলেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

124 আনাসের জন্য দোয়া... সম্পদে-সন্তানে আনসারদের শীর্ষে

হে আল্লাহ, তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন। আনাস বলেন: আল্লাহর কসম, আমার সম্পদ প্রচুর, আর আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান আজ প্রায় একশ গুনে পৌঁছেছে।

বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনা — সর্বসম্মত

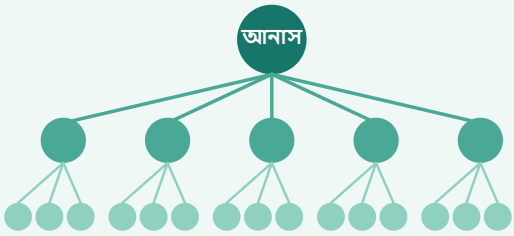

"আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান আজ প্রায় একশো"
আর বাঁচলেন প্রায় একশ বছর — বসরায় শেষ ইন্তেকাল করা সাহাবি

এক দরিদ্র ঘরে করা দোয়া... যাঁর জন্য করা হলো তিনিই সারা জীবন তার বাস্তবায়ন দেখলেন

সহজ কথায়

উম্মে সুলাইম নবী ﷺ-এর কাছে তাঁর ছেলে আনাসের জন্য দোয়া চাইলেন, তাই তিনি তাঁর জন্য **প্রচুর সম্পদ, বহু সন্তান ও বরকতের** দোয়া করলেন। আর আনাস বেঁচে থেকে তার সবটুকু নিজের চোখে দেখেছেন আর মানুষকে তা বলেছেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

আনাস তখন দশ বছরের ছোট বালক, যিনি নবী ﷺ-এর খেদমত করেছেন দশ বছর। তাঁর পরিবার আনসারদের ভেতর সবচেয়ে ধনীও ছিল না, সংখ্যায় সবচেয়ে বেশিও নয়। আর দোয়াটিতে ছিল **তিনটি নির্দিষ্ট বিষয়**, যা এক জীবন পরে মেপে দেখা যায়: সম্পদ, সন্তান, আর দুটিতেই বরকত।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **উভয় সহিহ গ্রন্থে**। আর কয়েক দশক পরে আনাস নিজেই তার বাস্তবায়ন বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম খেয়ে: "আমার সম্পদ প্রচুর, আর আমার সন্তান ও সন্তানের সন্তান আজ প্রায় একশ গুনে পৌঁছেছে।" এক বর্ণনায় এসেছে, বসরায় হাজ্জাজের আগমনের আগেই তাঁর প্রায় একশ বিশজন বংশধর দাফন হয়েছিল। তাঁর বাগানে বছরে দুবার ফল ধরত। আর তিনি প্রায় একশ বছর বেঁচেছেন, এবং **বসরায় সবশেষে ইন্তেকাল করা সাহাবি** তিনিই।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি ভিন্ন ধরনের প্রমাণ: **এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী, যাঁকে নিয়ে তা করা হয়েছে তিনি নিজেই তার বাস্তবায়ন দেখেন ও বর্ণনা করেন**। বর্ণনাকারী নিজেই উপকারভোগী, নিজেই সাক্ষী, আর তিনি তা বলছেন বসরায়, যেখানে তাঁর চারপাশে হাজারো মানুষ তাঁর অবস্থা জানে, তাঁর সন্তান, নাতি-নাতনি ও সম্পদ দেখে। তিনি বাড়িয়ে বললে নিজ শহরের লোকেরাই তাঁকে খণ্ডন করত। এর প্রতিষ্ঠিত সমান্তরাল আরও অনেক: ইবনে আব্বাসের জন্য বোধ ও কুরআনের ব্যাখ্যার দোয়া, তাতে তিনি হয়ে ওঠেন "উম্মতের পণ্ডিত"; সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের জন্য দোয়া কবুল হওয়ার দোয়া, তাতে মানুষ তাঁর দোয়াকে ভয় করত; আর যে ব্যক্তি অহংকারবশত বাঁ হাতে খেয়েছিল তার বিরুদ্ধে দোয়া, তাতে সে আর কখনো হাতটি মুখ পর্যন্ত তুলতে পারেনি। বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়ে বিচ্ছিন্ন সংবাদ, যার প্রতিটিই আলাদাভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল।

জড়বস্তুর তাসবিহ

125

তাঁর সামনে খাবারের তাসবিহ

আমরা খাবার খাওয়ার সময় তার তাসবিহ শুনতাম।

বুখারির বর্ণনা — সহিহ

তাঁরা এসব নিদর্শনকে বরকত গণ্য করতেন, ভীতির কারণ নয়

সহজ কথায়

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: **"আমরা খাবার খাওয়ার সময় তার তাসবিহ শুনতাম"** — অর্থাৎ নবী ﷺ-এর সামনে রাখা খাবার থেকে তাঁরা তাসবিহের একটি শব্দ শুনতে পেতেন।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

জড়বস্তুর কোনো আওয়াজ নেই। খাবার খাওয়া হয় নীরবে। আর তা থেকে তাসবিহ শোনা যাওয়া এমন এক বিষয় যার নজির কারও অভিজ্ঞতায় নেই। আর নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারও সম্পর্কে এমন কিছু বর্ণিতও হয়নি।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

বর্ণনাটি **সহিহ বুখারিতে** রয়েছে, "ইসলামে নবুয়তের নিদর্শন" অধ্যায়ে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তা বর্ণনা করেছেন বহুবচনে: "**আমরা শুনতাম**" — অর্থাৎ এটি বারবার ঘটা একটি সামষ্টিক পর্যবেক্ষণ, বিচ্ছিন্ন একটিমাত্র ঘটনা নয়। এর সমান্তরাল হলো তাঁর হাতের তালুতে **কঙ্করের তাসবিহ** সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত বর্ণনা, আর মক্কায় যে পাথর তাঁকে সালাম দিত তার কথা, যেমন সহিহ মুসলিমে জাবির ইবনে সামুরা থেকে এসেছে: "আমি মক্কার এমন একটি পাথর চিনি যা আমি প্রেরিত হওয়ার আগে আমাকে সালাম দিত; আমি এখনো তাকে চিনি।"

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

বহুবচন আর ধারাবাহিকতার রূপটিই শক্তির জায়গা: "**আমরা শুনতাম**"। একবার ঘটলে বলা হতো "আমরা শুনেছি"। কিন্তু ব্যবহৃত রূপটি বোঝায় পুনরাবৃত্তি ও অভ্যস্ততা — অর্থাৎ এটি তাঁদের কাছে পরিচিত একটি বিষয় ছিল, যা গোটা দল জানত। এমন কিছু শত শত জীবিত সাক্ষীর পরিবেশে বানানো যায় না। আর কুরআন এই গোটা বিষয়ের সাধারণ মূলনীতি ঘোষণা করে: "**আর এমন কিছুই নেই যা তাঁর প্রশংসায় তাসবিহ পাঠ করে না, কিন্তু আপনারা তাদের তাসবিহ বোঝেন না**" — তাসবিহ প্রতিটি বস্তুতেই চলমান, আর নবী ﷺ-এর উপস্থিতিতে যা ঘটেছে তা হলো **তা শোনার পর্দা সরিয়ে দেওয়া**, নতুন কিছু সৃষ্টি করা নয়।

প্রতিশ্রুত নিরাপত্তা

126

এখন আমরা তাদের উপর অভিযান চালাব, তারা আমাদের উপর নয়

আল্লাহর কসম, আমার মৃত্যুর আগে তারা আপনার কাছে পৌঁছাতে পারবে না ... খন্দকের দিনে তিনি ﷺ বললেন: এখন আমরা তাদের উপর অভিযান চালাব, তারা আমাদের উপর নয়; আমরাই তাদের দিকে যাব।

বুখারির বর্ণনা — সহিহ

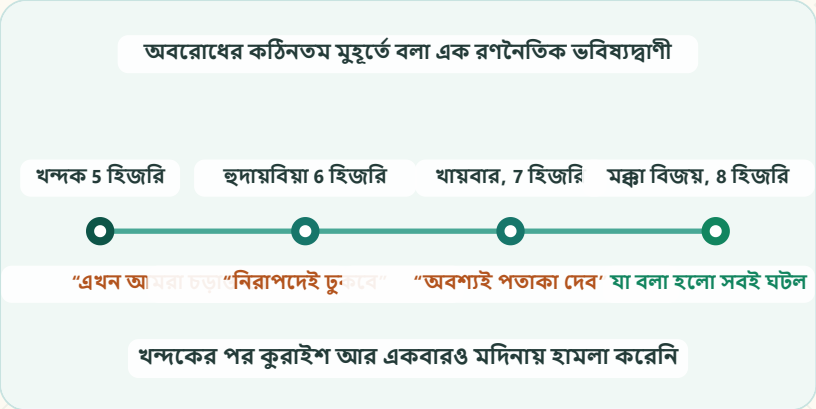

উদ্যোগের পূর্ণ উলটে যাওয়া... ঘোষিত হলো ঘটার আগেই

সহজ কথায়

আহজাবের বাহিনীগুলো মদিনা থেকে ফিরে যাওয়ার পর নবী ﷺ বললেন: **"এখন আমরা তাদের উপর অভিযান চালাব, তারা আমাদের উপর নয়; আমরাই তাদের দিকে যাব।"** আর সেদিন থেকে কুরাইশ আর কখনো মদিনায় হামলা করেনি।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

খন্দকের অবরোধ ছিল মুসলিমদের উপর দিয়ে যাওয়া সবচেয়ে কঠিন সময়। মদিনার চারপাশে দশ হাজার যোদ্ধা, ভেতর থেকে বনু কুরাইজার ইহুদিরা চুক্তি ভেঙেছে, আর ক্ষুধা, শীত ও ভয়। কুরআন বলে: "**আর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল, আর আপনারা আল্লাহ সম্পর্কে নানা ধারণা করছিলেন**"। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই উদ্যোগ উলটে যাওয়ার ঘোষণা আসে।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

হাদিসটি **সহিহ বুখারিতে**। আর তা হুবহু তাঁর কথামতোই ঘটেছে: খন্দকের পর (5 হিজরি) কুরাইশ আর একবারও মদিনার দিকে অভিযানে বের হয়নি। বরং মুসলিমরাই হয়ে ওঠে উদ্যোগের অধিকারী: 6 হিজরিতে হুদাইবিয়া, তারপর 7 হিজরিতে খায়বার, তারপর 8 হিজরিতে মক্কা বিজয়, তারপর হুনাইন ও তাবুক। আর এটি সিরাত ও ইতিহাসের সব গ্রন্থে স্বীকৃত একটি সামরিক বাস্তবতা।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

এটি **একটি কৌশলগত সংবাদ, আধ্যাত্মিক নয়**, আর সে কারণেই তা নিছক ঐতিহাসিক যাচাইয়ের আওতায় পড়ে। আর তা উচ্চারিত হয়েছে **সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ মুহূর্তে** — যখন সব লক্ষণ বলছিল ঠিক উলটোটা। জানা নিয়ম হলো, শ্বাসরোধী অবরোধ থেকে বেঁচে ফেরা ব্যক্তি নিজের অবস্থা মেরামতে ব্যস্ত হয়, আক্রমণে নয়। হাদিসের শব্দচয়ন লক্ষ করুন: তিনি বলেননি "আমরা জয়ী হব" — যা সাধারণ কথা, যেকোনো কিছুর সঙ্গেই খাপ খায় — বরং নির্দিষ্ট করেছেন **উদ্যোগের লাগাম হাতবদলের কথা**: "আমরাই তাদের দিকে যাব"। আর পরবর্তী তিন বছরে বাস্তবে যা ঘটেছে এটি তারই নিখুঁত বর্ণনা: এর পরের প্রতিটি অভিযান মদিনা থেকে বেরিয়েছে, মদিনার দিকে আসেনি।

সারকথা

১২৭ আমরা কেন এই সংবাদে আস্থা রাখি?

হে ঈমানদারগণ, কোনো ফাসিক আপনাদের কাছে সংবাদ নিয়ে এলে তা যাচাই করে নিন, যেন অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বসেন, আর পরে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে না হয়।

সূরা আল-হুজুরাত — আয়াত 6

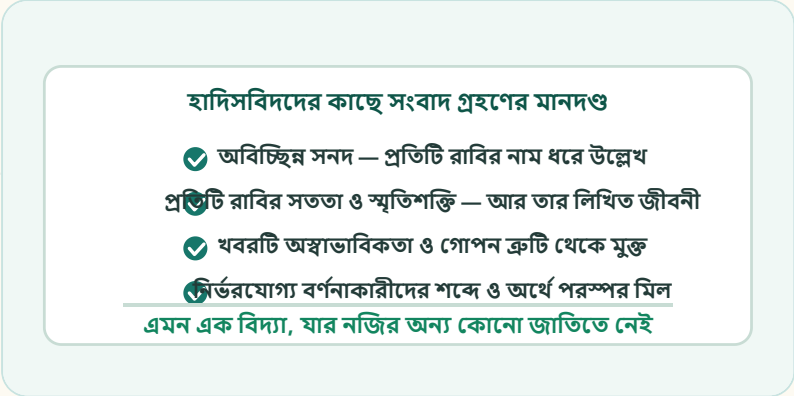

জারহ ও তাদিলের শাস্ত্র: লক্ষ লক্ষ বর্ণনাকারীর জীবনী লিপিবদ্ধ ও পরীক্ষিত

সহজ কথায়

এই সংবাদগুলো আমাদের কাছে মুখে মুখে ছড়ানো গল্প হিসেবে পৌঁছায়নি। পৌঁছেছে **একটি সুদৃঢ় নথিকরণ ব্যবস্থার** ভেতর দিয়ে: প্রতিটি সংবাদের রয়েছে নাম ধরে উল্লেখ করা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক সূত্র, আর প্রতিটি বর্ণনাকারীর রয়েছে লিখিত জীবনী, যাতে তাঁর সততা ও স্মৃতি যাচাই করা হয়েছে।

তখন মানুষ কী বিশ্বাস করত?

ইসলামের আগের জাতিগুলো তাদের নবিদের সংবাদ বহন করেছে কোনো সূত্র-পরম্পরা ছাড়াই। কে কার কাছ থেকে নিয়েছে তা জানা নেই, কখন তা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাও নয়, আর বাহক নির্ভরযোগ্য ছিলেন কি না তাও নয়। এ কারণেই সেসব জাতির গ্রন্থে সহিহর সঙ্গে জাল মিশে গেছে, আর ইতিহাসের সঙ্গে উপকথা।

বিজ্ঞান আজ কী বলে?

মুসলিমরা উদ্ভাবন করেন **ইসনাদের শাস্ত্র** আর **জারহ ও তাদিলের শাস্ত্র**, আর লিপিবদ্ধ করেন লক্ষ লক্ষ বর্ণনাকারীর জীবনী: প্রত্যেকের জন্ম ও মৃত্যু, তাঁর শিক্ষক, তাঁর ছাত্র, তাঁর সফর, তাঁর স্মৃতিশক্তির অবস্থা, শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতি এলোমেলো হয়েছিল কি না, আর তিনি যা বর্ণনা করেছেন তাতে অন্যরা তাঁকে সমর্থন করেছে কি না। রিজাল-শাস্ত্রের গ্রন্থগুলো — যেমন তাহজিবুল কামাল ও মিজানুল ইতিদাল — এ বিষয়ের বিশাল বিশ্বকোষ। অস্ট্রিয়ান প্রাচ্যবিদ আলয়েস স্প্রেঙ্গার বলেছেন, মুসলিমরা এমন এক জীবনীশাস্ত্র তৈরি করেছেন যার সমকক্ষ অন্য জাতিগুলো জানত না।

কেন এটি চূড়ান্ত মুজিজা?

লক্ষ করুন, এই অধ্যায়ের সংবাদগুলোতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য একত্র হয়েছে যা এড়ানো কঠিন: **বিপুলসংখ্যক সাক্ষীর সামনে সেগুলোর ঘটা** — খন্দকে এক হাজার, বদরে তিনশ, খেজুরকাণ্ডের হাদিসে একটি পূর্ণ মসজিদ; **একাধিক স্বতন্ত্র সূত্রে সেগুলোর বর্ণিত হওয়া**, এমন সাহাবিদের কাছ থেকে যাঁরা সেগুলো বানাতে একজোট হননি; **সেগুলোর ভেতর অপ্রীতিকর বিষয় থাকা** — বিষে এক সাহাবির মৃত্যু, খাবার কম পড়ার আশঙ্কায় জাবিরের ভয়; আর **সেগুলো মিথ্যা প্রমাণ করা নিয়ে প্রতিপক্ষের নীরবতা**, অথচ তারাই ছিল এ কাজে সবচেয়ে আগ্রহী। আর মানবেতিহাসে এমন কোনো মানুষ জানা নেই যাঁর সংবাদ, বাণী ও কর্ম এত নিখুঁতভাবে আর এত বিস্তারিতভাবে বাহিত হয়েছে।

সূত্র «ابن الصَّلاح – «مُقَدِّمةُ ابن الصَّلاح» · الخطيب البغدادي – «الكِفايةُ في علم الرِّواية»